Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 12 - 21
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 12 - 21
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

নিত্য মালাকারের কাব্যগ্রন্থ 'সূত্রধারের স্বগতোক্তি' : একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

ড. সুবীর বসাক
সহকারী অধ্যাপক
অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়
অমরপুর, গোমতী, ত্রিপুরা
Email ID: subir.bangla@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Bengali poetry of North Bengal, Personal life, Partition, Refugee, Social philosophy, Artistic sense, Poetry construction, Separate discourse.

Abstract

Nitya Malakar is an unforgettable name in the history of Bengali poetry of North Bengal. The poet was born on August 18, 1947 in the then East Pakistan. After becoming refugees from East Pakistan in 1956, his family took shelter in Nabadwip district of West Bengal. It was there that he came in contact with poets Arun Basu and Neelkant Roy, the editors of 'Palabadal' and 'Agyatbas' little magazine, and the initial basis of his becoming a poet was formed. In 1968, he started living in Khalishamari, North Bengal, with a job as a primary school teacher. There, poets like Arunesh Ghosh, Anubhav Sarkar, Santosh Singh, Subrata Roy etc. became acquainted with him one by one. Which broadened his field of understanding. Nabadwip was the preparatory phase of his poetic practice, which culminated in Khalishamari-Mathabhanga. The total number of poetry books of Nitya Malakar is six. In 2018, this poet's pen stopped forever.

Nitya Malakar's first book of poetry is 'Sutradharer Swagatokti' (1988). The book contains a total of 39 poems. Among them, 15 poems have been analyzed in the context of the text. A discussion of all the poems is not possible within the limited scope of the article. By discussing these 15 poems, we have been able to create some idea about the book of poetry. If we divide the poems in the book of poetry into categories according to the subject, we can find - poems related to personal life, poems related to artistic sense, poems related to philosophy of poetry, poems related to social philosophy, poems related to love, poems related to death, etc.

Many poets appeared in the Bengali poetry of North Bengal in the sixties and seventies. Notable among them are Samir Chakraborty, Sanat Chatterjee, Tushar Bandyopadhyay, Bimal Bhattacharya, Diptimoy Sarkar, Arunesh Ghosh, Pushpajit Roy, Ranjit Dev, Samir Chatterjee, Tridiv Gupta, Shamser Anwar, Ratan Biswas, Shasthi Bagchi, Kamlesh Raha Roy, Tuhin Das, Bratati Ghosh Roy, Neerad Roy, Punyashlok Dasgupta, Kankan Nandy,

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 12 - 21
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Vijay Dey, Samar Roy Chowdhury, Benu Sarkar, Samiran Ghosh and others. It is not difficult to recognize Nitya Malakar in the crowd of these representative local poets. The main reason for this is the structure of Nitya Malakar's poetry. Apart from the subject, he has been able to create a separate discourse in Bengali poetry only in construction. His extraordinary mastery of cursive and prose and his extensive use of similar words have made Nitya Malakar a permanent fixture in Bengali literature.

Discussion

বাংলা কবিতার ইতিহাসে নিত্য মালাকার একটি অবিস্মরণীয় নাম। কবির জন্ম ১৯৪৭–এর ১৮ আগস্ট তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। ১৯৫৬ সালে অগুনতি উদ্বাস্তু পরিবারের মতো সহায় সম্বলহীন হয়ে আশ্রয় নেন পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপ জেলায়। উদ্বাস্তু পরিবারের নিয়তি নির্ধারিত পথেই দারিদ্রকে সঙ্গে নিয়েই বেড়ে ওঠা। তবে তাঁর কবি হয়ে ওঠার পেছনে সবচেয়ে বড়ো অবদান ছিল ‘পালাবদল’ পত্রিকার সম্পাদকদ্বয় অরুণ বসু ও নীলকান্ত রায়-এর। ১৯৬১ সালে নবদ্বীপ থেকে ‘পালাবদল’ নামে একটি লিটল ম্যাগাজিন বেরোত। নিত্য মালাকার তখন স্কুল পড়ুয়া। পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে ফরোয়ার্ড লাইব্রেরীতে (পোড়ামাতলা, সম্পাদক নিতাই পোদ্দার) সাহিত্যচর্চার যে অনুকূল পরিবেশটি পেয়েছিলেন, সে সম্পর্কে একটি স্মৃতিচারণায় তিনি লিখেছেন,

> “সাহিত্যচর্চার পক্ষে সেই অনুকূল পরিবেশটিতেই অরুণদা আমাকে ভর্তি করালেন। ...প্রথম দিন থেকেই শুরু হল আড্ডা। অরুণদা, নীলকান্তদার তর্কাতর্কি, ইয়ার্কি এবং দৈনন্দিন স্বরচনা পাঠ ইত্যাদির ভেতর দিয়ে বেঢপ বেড়ে উঠতে লাগলাম।”[১]

‘পালাবদল’ বেড়িয়েছিল ১৯৬৫ সাল অব্দি। পত্রিকার জন্য কবিতা সংগ্রহ, বিজ্ঞাপণ সংগ্রহ, চিঠিপত্র বিনিময় ইত্যাদি সব কাজেই তিনি ছিলেন অরুণ বসুর সহযোগী।

‘পালাবদল’ যখন শেষ হতে যাচ্ছে সেই সময় বাংলা সাহিত্যের স্থিতাবস্থাকে ভাঙবার প্রচেষ্ঠায় গড়ে ওঠে হাংরি আন্দোলন। মলয় রায় চৌধুরী, শৈলেশ্বর ঘোষ প্রমুখদের দ্বারা গড়ে ওঠা আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগে ‘পালাবদলে’ও। ‘কবিতার কনজারভেটিভ পাঠকদের দুঃসহ যন্ত্রণা- নেতৃত্ব : নিত্য মালাকার’ ইত্যাদি জাতীয় পোস্টার সেদিন ‘পালাবদলে’ প্রকাশিত হয়েছিল। এর পাশাপাশি মার্ক্সিস্ট কেন্দ্র প্রগতিপরিষদের লোকেদের দ্বারা মগজ ধোলাইয়ের ঘটনাও রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। এই সব ঘটনার উল্লেখ পরবর্তীতে তাঁর কবিতা নির্মাণের জগৎটিকে অনুধাবনে সহায়ক হবে।

১৯৬৬ সাল ছিল পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতিতে একটা অগ্নি স্ফুলিঙ্গময় সময়। খাদ্যের দাবীতে শহরের রাজপথ তখন উত্তাল। কংগ্রেস সরকারের কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে বামপন্থী দলগুলির গণজাগরণের ঢেউ এসে লাগছে স্কুল – কলেজ – কারখানা - অফিস সর্বত্রই। ইট - পাথর - ভাঙচুর, ট্রাম - বাসের পোড়া গন্ধ, থানা-অফিস ঘেরাও ছিল আন্দোলনকারীদের হাতিয়ার। পুলিসও চুপ থাকেনি। সর্বশক্তি নিয়ে আন্দোলন দমন করতে অলিতে-গলিতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই প্রেক্ষাপটে গ্রেফতার হন ‘পালাবদল’-এর সম্পাদক কবি অরুণ বসু। নিত্য মালাকারও নবদ্বীপ ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত থাকার কারণে। এরপরে অরুণ বসু জেল থেকে ছাড়া পেলে বেরোয় নতুন পত্রিকা ‘অজ্ঞাতবাস’ (১৯৬৬)। সম্পাদক অরুণ বসু। এবারেও সহযোগী হিসাবে সেই নিত্য মালাকার। এই ভাবে অরুণ বসুর ঘনিষ্ঠ সহচর্যে কবিতার জন্য নিত্য মালাকারের মানসিক গড়নটি তৈরি হয়েছিল। এমনিতেই পিতাকে হারিয়ে অর্থনৈতিকভাবে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। এমন সময় উত্তরবঙ্গে এসে শিক্ষকতার চাকরি করবার একটা সুযোগ এসে যায় তাঁর কাছে। ফলস্বরূপ আরেকবার ভিটে-মাটি ত্যাগ। এবারের ঠিকানা হল খলিশামারী, কোচবিহার। সময়টা ছিল ১৯৬৮-এর মার্চ মাস।

খলিশামারীতে এসে ‘পঞ্চানন স্মৃতি বিদ্যাপীঠ’-এ প্রাথমিক শিক্ষক হিসাবে যোগ দিলেন। প্রথম দর্শনেই খলিশামারী ছিল এক নতুন বিস্ময়ের দেশ। উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি ও মানুষের স্বাতন্ত্র্য তাকে মুগ্ধ করেছিল, কবিতায় বারেবারে সে কথা উঠে এসেছে। উত্তরবঙ্গে এসে শিক্ষকতার পাশাপাশি সমান্তরালভাবে চলছিল কবিতাচর্চা। ইতিমধ্যে তাঁর সাথে পরিচয় গড়ে ওঠে উত্তরবঙ্গের আরেক বিখ্যাত কবি অরুণেশ ঘোষের সাথে। এই পরিচয় পর্ব সম্পর্কে নিত্য মালাকার লিখেছেন,

> "ইতিমধ্যে একদিন এক এপ্রিল সকালে অরুণেশদা অর্থাৎ অরুণেশ ঘোষ এলেন আমার লাল কালিতে লেখা চিঠির ডাকে। তখন সদ্য অষ্টমঙ্গলা থেকে ফিরে প্রায় একই ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবী-পাজামা পড়ে এসেছিলেন তিনি।"[২]

সন্দেহ নেই অরুণেশ ঘোষের সংসর্গ নিত্য মালাকারের অনুভবের জগৎটিকে আরো প্রসারিত করেছিল।

১৯৮৩ সালে কবি খলিশামারী ছেড়ে মাথাভাঙায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন। ১৯৮৪ সালের দিকে তাঁর সাথে একে একে পরিচয় গড়ে উঠলো কবি অনুভব সরকার, কমল সাহা, স্বপন মিত্র, সন্তোষ সিংহ, সুব্রত রায়, নকুল মণ্ডল প্রমুখদের সাথে। তাঁদের নিয়ে গড়ে উঠলো এক নতুন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। যা তাঁর কবিতাচর্চায় স্থায়ীভাবে সক্রিয় ছিল। এ সম্পর্কে নিত্য মালাকার লিখেছেন,

> "মাথাভাঙ্গার সাংস্কৃতিক তৎপরতার উৎসব 'সারস্বত উৎসব'। জানুয়ারী চুরাশিতে পরিচয় হলো ঐ পাগলদের সাথে। অরুণেশদা না পেরেই ছুটে এলেন, আমাদের নতুন ভুবন তৈরি হলো। আড্ডা, হুল্লোড় ও মত্ততায় প্রতিদিনই উৎসবের, প্রতিদিনই সৃষ্টির কল্পনায় ও রঙে সে এক অন্য বর্ণিল জগৎ আমাদের। মাথাভাঙ্গা শহর থেকে তখন একই সাথে অনেকগুলো লিটল্ ম্যাগাজিন বেরোচ্ছে। অনুভব সরকার-কমল সাহার 'টার্মিনার্স', স্বপন মিত্র-ধনেশ্বর বর্মণ সম্পাদিত 'প্রতীতি', সন্তোষ সিংহের 'ময়ূখ' ও পরে 'ঋষ্যমূখ' এবং সুব্রত রায় ও নকুল মণ্ডল সম্পাদিত 'যুদ্ধ এবং'। প্রত্যেকটি কাগজেই আমরা কমবেশি জড়িত লেখালেখি ও আনুষঙ্গিক ভাবনা পরিকল্পনার সূত্রে।"[৩]

এই ভাবে নবদ্বীপ থেকে এসে উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক গ্রাম খলিশামারীতে নিত্য মালাকারের কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ। এই সব কথা বলা হল শুধুমাত্র কবি হিসাবে নিত্য মালাকারের বেড়ে ওঠাকে চিত্রায়িত করবার জন্য নয়, একই সাথে সেইসব পাঠকের সাথে নিত্য মালাকারকে পরিচয় করানোর জন্য, যাঁরা উত্তরবঙ্গের বাংলা কবিতা সম্পর্কে খুব বেশি ওয়াকিবহাল নন। যাইহোক নিত্য মালাকারের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল- 'সূত্রধারের স্বগতোক্তি' (১৯৮৮), 'অন্ধের বাগান' (১৪০১), 'দানাফসলের দেশে' (২০০২), 'গীতবিতান প্রসুত রাত্রি এই বৃষ্টিধারা' (২০০৮), 'যথার্থ বাক্যটি রচনার স্বার্থে' (১৪১৯), 'কবিতা সংগ্রহ প্রথম খণ্ড' (২০১৪), 'নিমব্রহ্ম সরস্বতী' (১৪২২) ইত্যাদি।

নিত্য মালাকারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সূত্রধারের স্বগতোক্তি'র রচনাকাল ১৯৬৬-১৯৮৬। যার সূচনা নবদ্বীপে এবং সমাপ্তি খলিশামারীতে। প্রায় কুড়ি বছরের এই লেখালেখির মাঝে কয়েকবার বিরাম পড়েছে। তিনি নিজেই জানিয়েছেন, বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর এবং আটাত্তর থেকে একাশি পর্যন্ত প্রায় আট বছর কবিতার সাথে তাঁর কোনো যোগাযোগ ছিল না। নানান পারিবারিক সমস্যায় এই সময় সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তাই সাতের দশকের উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল ঘটনার আবর্ত থেকে বেঁচে গিয়েছিল নিত্য মালাকারের কবিতা। তাঁর 'সূত্রধারের স্বগতোক্তি' কাব্যে মোট ৩৯টি কবিতা রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি আবার সিরিজ কবিতা। যাইহোক আমরা আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে কাব্যটির মূল সুরকে কিছুটা হলেও ধরবার প্রয়াস করবো।

'বিচূর্ণ ব্যক্তিগত' (অংশ) :

'বিচূর্ণ ব্যক্তিগত' (অংশ) সিরিজের 'হা-মানুষ' কবিতাটি শুরু হচ্ছে পৌষের কুয়াশাঢাকা ভোরে নদীর উঁচু পাড় ঘেঁষে আদুল গায়ে নির্বিকল্প সমাধির মতো চারজন মানুষের জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকার একটি দৃশ্য কবি কর্তৃক দৃশ্যমান হবার মধ্য দিয়ে। কবি সেই সব মানুষদের জীবনকে বুঝতে চাইতেন। কীভাবে তারা গরুর দড়ি হাতে নিয়ে বিড়ি মুখে ঘন্টার পর ঘন্টা অবলীলায় কাটিয়ে দিতে পারেন। কবি সেই সব জীবন অভিনয় করে দেখতে চাইতেন কিন্তু তা অসম্ভবে পর্যবসিত হতো। কবির ছেলেবেলায় দেখা সেই সব দৃশ্য মাঝেমধ্যে তাঁর ঘুমের মধ্যেও ঘুরে ফিরে আসতো। তাই ঘুমের মধ্যে আঁতকে উঠবার রোগ হয়েছে মনে করে কবির পিতা ব্রজ বোষ্টমকে দিয়ে কবিকে মাদুলী পরিয়ে দিয়েছেন। যে মাদুলী গলগ্রহের মতো কবি বয়ে নিয়ে চলেছেন। কবি যখনই সেই সব বিষয়ে পিতার কাছে জিজ্ঞাসা রেখেছেন, পিতা সব প্রশ্ন এড়িয়ে পথচলতি কাউকে 'শয়তান' বলে উঠতেন।

অথচ সেই চারজন হা-মানুষের হুবহু ছবি কখনোই কবির মনে ধরা পড়তো না। পথ চলতে চলতে হঠাৎ পায়ে কাঁটা ফুটে যাবার মতো সময়ে অসময়ে মনে পড়ে যেত সেই দৃশ্য। যেভাবে একদিন চকিতে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে সীতা মা কালীর সাক্ষাৎ পেয়ে যায়, তেমনিভাবে কবিও হঠাৎ একদিন খোদাবকস্, কেরামতুল্লা, সিয়ারাম, বুলবুলদের মুখোমুখি

হয়ে যান। তাদের উল্লাস ও নাচানাচির মধ্যে কবি ভয়ার্ত চিৎকারে যখন বাবা-মা'কে ডাকতে গেলেন তখন তারা কবির জামাকাপড় কেড়ে নিয়ে তাকে উলঙ্গ করে তুললেন। কবি লজ্জায় হাঁটু গেড়ে বসতে গেলে তার কোমল শিশু শরীর তাদের থুৎকারে ভরে উঠলো। কবি ক্ষমাপ্রার্থী হলে তারা পোষাকগুলো জড়ো করে ফেলে দিলেন। এই পর্যন্তই কবিতাটির দৃশ্যমানতা। এরপরে কবির উপলব্ধি-

> "বহুদিন পর, আজও থুৎকারে ঘৃণার মধ্যে মানুষের অনুগ্রহে আর-এক
> জন্মের জন্য উন্মুখ হয়ে আছি, এই খোলসশরীর পালটে দাও, হে হা-মানুষ।"[৪]

কবিতাটির ঘটমান সময় এবং কবির উপলব্ধিগত সময়ের মাঝখানে রয়েছে অনেকটা ব্যবধান। কৈশোরকালে যে জীবনকে তিনি দেখেছিলেন, তা ছিল অনুনকরণীয়। তার মুখোমুখি হতে গিয়ে তাকে হতে হয়েছে উলঙ্গ এবং ভীত। পরবর্তীকালে তিনি যখন কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছেন তখন সেই খোলসবিহীন নির্ভেজাল জীবনসত্যের কাছে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়েই কবি হিসাবে নিত্য মালাকারের জীবনদর্শন স্পষ্ট হয়ে যায়।

'ভাতের মানদণ্ডে ইদানীং শিল্পবোধ' : নবদ্বীপ থেকে খলিশামারীতে এসে লেখা প্রথম কবিতা এটি। কবি জানেন, 'হাত-পা ছুঁড়লেও কিছু কবিতার উপকার হয়' অর্থাৎ কবি ইচ্ছে করলেই সস্তা জনপ্রিয় কিছু লেখা লিখতেই পারেন। কিন্তু সেই জাতীয় কবিতা রচনায় কবির অন্তরের সায় নেই। অথচ কবি জানেন সমকালীন শিল্পবোধ শুধু 'ভাত খাওয়ার'ই নামান্তর অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক আশ্রয় এবং জনপ্রিয়তাই সমকালের একমাত্র লক্ষ। এ মত পরিস্থিতিতে কবি অসম্ভবেরই সাধনা করেন। চরাচর বিস্তারী অন্ধকারের মধ্যে থেকে জোনাকির আলোর মতো ইতিবাচকতা সংগ্রহ করে রাখেন জীবন থেকে। অথচ যে ধরণের কবিতা তিনি লিখতে চান তাও সম্ভব হয় না সবসময়। প্রত্যাশা অনুযায়ী লিখতে পারেন না বলে তাঁর মনে হয় প্রতিদিন আরাম খায় কলমের ছুঁচ। কবি সেই কবিতা যুবতীকে বিঁধতে পারেন না। কবির হৃদয় সেক্ষেত্রে দ্বিধাবিভক্ত। দ্বন্দ্বগুলি হল-

এক. কেন সম্ভব নয় কবিতার দ্বারা আত্মোপকারিতা?

দুই. ভাত ছাড়া কি কোনো আগুন নেই ক্ষুধা নাশ করে?

কবি শৈশবে উদ্বাস্তু হয়েছেন পূর্বপাকিস্তান থেকে, বেঁচে থাকার তাগিদে দ্বিতীয়বার উদ্বাস্তু হতে হয়েছে নবদ্বীপ থেকে খলিশামারীতে। নবদ্বীপে যে কষ্টকর জীবন কাটিয়েছেন, তা থেকে কিছুটা আশ্রয়ের নিরাপত্তা পেয়েছেন উত্তরের প্রত্যন্ত শহরটিতে। তাই খলিশামারীতে এসে তাঁর মনে হয়েছে, এতো ভাত, এতো জলখাবার তিনি কীভাবে বরদাস্ত করবেন।

কবিদের প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ঘোড়দৌড়ে তিনিও টিকে থাকতে চান। তাই খুব সঙ্গোপন হাঁটেন কোচবিহার থেকে নবদ্বীপ বা কলকাতা। কিন্তু সেই বিশ্বাসেও নেই তেমন কোনো আস্থা। কোচবিহারের মানুষ, আকাশ ও প্রকৃতি তাঁর কাছে মনোমুগ্ধকর হয়ে ওঠে। তথাপি তিনি মিথ্যা শব্দে আত্মোপকার সুলভ কবিতা লিখতে পারেন না। তাই কাব্যলক্ষ্মীর কাছে তিনি প্রার্থনা জানান —

> "দ্বিধান্বিত কেন তুমি, বুকে হাত রাখো:
> শস্যশ্যাম সোনার বাংলায়—
> উদ্ভিজ্জ ভাতের গন্ধে মাংসল কবিতা হবে আজ?"[৫]

'১১ আগস্টের স্বপ্ন' : একটি দেশভাগের কবিতা। দেশভাগ পরবর্তী কবি মনের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাবে এই কবিতায়। দেশভাগ কবির কাছে শিরদাঁড়া ভেঙে যাবার মতো। দেশভাগের দুঃখের সেই পাষাণ কবি বহন করে চলেছেন। অখণ্ড বঙ্গদেশের স্থবির মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে তার ভাষা-কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে নেই কোনো ভিন্নতা। নিশ্চল জলের প্রতিচ্ছবির মতোই তা অখণ্ড কিন্তু সেই রকম অখণ্ড মিলন পরীক্ষকের না-পছন্দ। যেখানে অণু থেকে পরমাণুসমূহ এক বিশেষ ধর্মে বাঁধা-যে ধর্ম অভিন্নতার। তার ভাষা-কৃষ্টি-সংস্কৃতি সমূহ মিলনের বৈশেষিকতাতেই দৃঢ়। তাই কুটিল পথে হয়েছে দেশভাগ। এই ভাবে উপমহাদেশের মানচিত্রে গড়ে ওঠে নতুন দেশ। আজ যদি কোনো কুটিল কথক জানতে চায়

কী ছিল সেই অখণ্ড দেশের সংহতির চিহ্ন? তখন কী খুঁজে পাওয়া যাবে দেশের সেই স্বপ্নময় যুগ্ম প্রতিচ্ছবি? এই প্রশ্ন উত্থাপনের মধ্য দিয়েই পরিসমাপ্ত হয়েছে কবিতাটির।

'চোখের পাতার নীচে ঘুম' : একটি মৃত্যুভাবনা বিষয়ক কবিতা। কবি জানেন না কবে ঠিক কোন মুহূর্তে মৃত্যু এসে হাজির হবে অথবা কেমন হবে তার স্বরূপ। হয়তো সেই মুহূর্তে ভেঙে যাবে হাসিমুখ, অথবা মদের গেলাস চলকে ওঠার মতো উঠে আসবে রক্তের বিস্বাদ। সারা শরীর জুড়ে জ্বলে উঠবে বিদ্যুৎ, মটকে উঠবে সমস্ত আঙুলগুলি একসাথে। হয়তো তখন কেউ এসে ডাকবে অথবা ঠেলে দেবে লাল-সাদা কোনো বিন্দুর দিকে। ক্রমশ নিভে আসতে থাকবে চোখের পাতা। তখনও কবি গেয়ে যাবেন বেঁচে থাকার গান। এইভাবে তাঁর মৃত্যুবিষয়ক উপলব্ধিগুলি ধরা পড়েছে কবিতাটিতে।

'আত্মঘাতকের সামনে একদিন' : এ কবির আশা তিনি কবি হিসাবে একদিন না একদিন প্রতিষ্ঠা পাবেনই কিন্তু তাঁর বর্তমান অবস্থা বাংলাদেশের মানচিত্রের মধ্যে নিভৃত এক কোণে ঘাড় গুঁজে থাকা। অর্থাৎ বঙ্গের এক প্রান্তিক অঞ্চল খলিশামারীতে বসে নিভৃতে সাহিত্য সাধনা করে চলেছেন তিনি। যেখানে কোনোক্রমে শীত ও বর্ষার আচ্ছাদনের নীচে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তবু তাঁর প্রত্যাশা সেই শীতের চাদর ও বর্ষার ছাতা সরিয়ে হাসিমুখে তিনিও একদিন প্রতিষ্ঠিত কবিদের সাথে এক সারিতে দাঁড়াতে পারবেন।

'পর্দা ও নিশান উড়ছে' : 'পর্দা' হল আড়াল, যা কবির নিজস্ব যাপিত জীবনের কথাকে প্রকাশ করছে। আর 'নিশান' মানে ধ্বজা, যা আসলে বিজয়কেতন। কবি নীরবে তাঁর সাহিত্যসাধনা করে চলেছেন। এই ভাবে উঠোনে কাঁঠালপাতা জড়ো হওয়ার মতো সময় বয়ে চলেছে। কিন্তু কবির চোখে স্বপ্ন বনস্পতির, স্বপ্ন দীঘার ঢেউ। অথচ উঠোন জুড়ে সমতল মাটিতে যা জন্মাচ্ছে, তা শুধু ঝাউগাছ। অন্যদিকে কবির গার্হস্থ্য জীবন কঠিনতায় পুড়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি কবি যে সাহিত্য রচনা করে চলেছেন তাতেও রয়েছে অজানা কোনো আশঙ্কা— হয়তোবা প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার আশঙ্কা। ফলে নিরাপদ আশ্রয় ও আত্মোন্বেষণে ক্রমশ ধূলো জমছে। এইভাবে কবি তাঁর নিজস্ব অভ্যাস ত্যাগ করে উঠতে পারছেন না।

কবি চারপাশের সমাজে তাকিয়ে সৃজনশীল কোনোকিছুই খুঁজে পান না। মানুষ যেন শুধু স্বপ্ন ও সংগমে ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন। চারপাশে কবিসম্মেলন, সভা ও সমিতি করে যারা প্রতিষ্ঠা পাচ্ছেন, সেখানেও রয়েছে শুধুই 'মুখর স্তব্ধতা'। এরপরে কবি নিজের কবিতায় ইন্ধন দিচ্ছেন, আগুন জ্বালছেন এবং কবিতালক্ষ্মীকে প্রশ্ন করছেন— তিনি কি সেই আগুন নিভিয়ে ঘুমাতে পারবেন? এই ভাবে নীরবে, নিভৃতে নিত্য মালাকার ক্রমশ সক্রিয় হয়ে উঠছেন। উড়িয়ে দিচ্ছেন কবিতার শরীর তথা ধ্বজা।

'এই প্রতিহাওয়া' : এই প্রতি হাওয়ায় অর্থাৎ প্রতিকূল কোনো পরিস্থিতিতে কবি চুপচাপ থাকবেন এমন সীদ্ধান্ত নিয়েছেন। এমত পরিস্থিতিতে তিনি কীভাবে কলম ধরবেন, কারণ কলম ধরলেই প্রিয় শব্দরাজির প্রতি অনুরাগ কবিকে অনেক সময় বেপুথগামী করে। সেই অনুরাগ নিয়ন্ত্রণ করা কি সহজসাধ্য হবে? তাই তিনি নিশ্চুপ থাকার সীদ্ধান্ত নেন। তার চাইতে বরং ভাতের গল্প, হাড়িকুড়ি তথা গার্হস্থের সামান্য টুকিটাকি বিষয়ক গল্পে মশগুল থেকেই জীবন কাটিয়ে দিতে চান। তবে নিশ্চুপ থাকার আরো একটি কারণ হল তিনি কোনো ভাবেই মনের দৃঢ়তাকে উন্মুক্ত করতে চান না। তাতে নিজস্ব ভাবনাগুলি সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে যেতে পারে। তাই তিনি নিজেকে গোপন রাখার সীদ্ধান্ত নেন। অথচ চারপাশ জুড়ে যা রচিত হচ্ছে সে সম্পর্কে তাঁর লিখিত বয়ান হল—

> "চাঁদের বাহারি শোভা আলো নদীর দুকূল উপচে বান...
> আমি চাই না এমন হতচ্ছাড়া সৃষ্টি অনুরাগ-"[৬]

অর্থাৎ চারপাশ জুড়ে চলছে শুধু রোমান্টিক বিলাসের কবিতা। কিন্তু সেই জাতীয় কবিতা রচনা কবির অভিপ্রায় নয়। কবিতায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার কারণে অনেক সময় তাঁর মনে হয়েছে যেন সবকিছুই ভুল হচ্ছে। যেখানে অন্য কবিরা মানুষের

মধুময় জীবন সঙ্গীত লিখেই প্রতিষ্ঠা পাচ্ছেন, সেখানে কবিতার জন্য প্রতিনিয়তই সংঘর্ষময় পথে হাঁটতে হচ্ছে নিত্য মালাকারকে।

'নষ্ট চিঠির সূত্রে' : একটি প্রেমের কবিতা। বরং বলা যেতে পারে ব্যর্থ প্রেমের কবিতা। কোনো একদিন প্রেমিকা তার পুরনো পোশাক-আশাক খুঁজতে গিয়ে হয়তো খুঁজে পাবে বহুদিন আগের একটি চিঠি। সেদিনও হয়তো তিনি দুরু দুরু বুকে তার গোপন পাঠ নেবেন। হয়তো সেই দিনটি হবে কোনো আষাঢ়সন্ধ্যা। সিউড়ির আকাশে থাকবে মেঘ, বাতাসে থাকবে অচেনা ফুলের গন্ধ। চতুর্দিকে পরিপূর্ণ সেই সেই মিলনের পরিবেশ একসময় ভারাক্রান্ত হবে বিরহের অন্ধকারে। এরপরে তার মনের মধ্যে জেগে উঠবে পূর্ব লালিত সেই সব প্রশ্ন ও দীর্ঘশ্বাস। যেখানে একদিন প্রেমিকা বলেছিলেন,

"এক ভাবে কাটিয়ে দেব একলা ও কর্তব্য নিয়ে, তুমি ভুলে যাও সব"[৭]

কবি আজ জানেন না তাঁর সেই প্রেমিকা এখন কোথায় রয়েছেন— সিউড়ি, কলকাতা, নাকি গ্রামে? এরপরে কবির মনে হয়েছে এতদিনে প্রেমিকার শরীর নিশ্চয় হয়েছে মেদযুক্ত স্বাস্থ্যজ্জ্বল। হয়তবা আসবাবপত্র ও প্রসাধনী সামগ্রীর দ্বারা সজ্জিত হয়েছে এক সুখী গৃহকোণ। তথাপি কবির ধারণা—

"তবু মাঝরাতে খিড়কিপথে বেড়াল পালায়,
তুমি জেগে থাকো একা একা সন্ন্যাসিনী শিক্ষিকার
মশারির নীচে।"[৮]

'আমার খলিশামারী' : কবির কর্মের জগৎ, তাঁর কবিতা রচনার বিষয়-আশয় ইত্যাদি নিয়েই কথা বলেন এই কবিতায়। কর্মসূত্রে কবি নবদ্বীপের ভিটে-মাটি ছেড়ে উত্তরবঙ্গের এক প্রান্তিক গ্রাম খলিশামারীতে বাস করছেন। সেখান থেকেই তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর সাহিত্য সাধনা। সেই খলিশামারীই যেন কবির কাছে হয়ে উঠেছে সাহিত্য সংস্কৃতির পীঠস্থান কলকাতা। প্রিয় কলমের মুখে থুতনি রেখে তিনি লিখে চলেন তাঁর কবিতাগুলি। কলমের মুখে থুতনি রাখলে যে যন্ত্রণা হয়, তাঁর কবিতাগুলি যেন সেই যন্ত্রণারই ফসল। কখনো আবার হয়তোবা রোষের থেকে জন্ম নিচ্ছে সেই সব কবিতা। তাই নিজের কবিতাকে তিনি এখানে বিষের সাথে তুলনা করেছেন। সে যাইহোক কবি যেন এখানে প্রজাপতি ব্রহ্মা। তাঁর নাভি থেকে জন্ম নিচ্ছে সমুদ্রগামী আদি নাগ। যদিও নিজের জীবনে লোকনিন্দা ছাড়া আর কিছুই জোটেনি কবির তথাপি কবির বিশ্বাসের ভিত এতটুকুও টলেনি। নিজের সাহিত্য সাধনাকে ছাতিম গাছের নীচে পাথর পূজার সাথে তুলনা করে তিনি বলেছেন বাংলা কবিতার ইতিহাসে খলিশামারীও একদিন জায়গা করে নেবে।

'যাও পাখি' : নকশাল আন্দোলনের কবিতা। নকশাল আন্দোলনের সময়কার রক্তক্ষয়ী দিনগুলিকে ছোটো ছোটো কিছু চিত্রকল্প এবং সংকেতের মাধ্যমে ধরতে চেয়েছেন তিনি। আমরা জানি কিছু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নকশাল আন্দোলনের ভেতরে যুক্ত থেকে তাকে কলঙ্কিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু কবি নকশালদের স্বপক্ষেই কলম ধরেছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকেই তিনি কথাগুলি বলেছেন এখানে। পরে থাকা উচ্ছিষ্ট ভাঁড়, সিগারেট, দেশলাইকাঠি, জোছনার নীচে শপথ গ্রহণ, হাত তোলা, পরে থাকা চিরকুট, মাকে লেখা পত্র কবিতায় ইত্যাদি উপকরণের সমাহার নকশাল কর্মীদের জীবনের আখ্যানকে ধারণ করে রয়েছে। এরপর কবি নকশাল কর্মীদের উৎসর্গীকৃত জীবনের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন-

"কাকজোছনার নীচে শাল বন রাঢ় দেশে ছায়া বীথি
রণঘোর নীতি আর নৈশভোজ ধূমপান, উৎসর্গ-জীবন
যৌবনের শীত ছিল, শাসন কামড় ছিল মধ্যরাতে
কুজ্ঝটিকা ছিল কিছু"[৯]

নকশালদের উৎসর্গীকৃত জীবনে যেমন তারুণ্যের আবেগ ছিল তেমনি হয়তো ছিল কিছু ভুল-ভ্রান্তি। যাকে কবি 'কুজ্ঝটিকা' বলেছেন। সেই তারুণ্যের আবেগেই তারা শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রামে-গঞ্জে-মফস্বল এলাকাগুলিতে আন্দোলনের আগুনকে ছড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। পাশাপাশি উঠে এসেছে সরকার কর্তৃক নকশালদের ধরপাকড়ের জন্য

পুলিশি অভিযানের চিত্র। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কৌশলে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে অনেক নকশালকর্মী প্রাথমিক কিছু সফলতা পেলেও সরকারের নৃসংশ দমন-পীড়ন নীতির কাছে শেষ পর্যন্ত তাদের আত্মসমর্পণ করতেই হয়। কবি তাই লিখেছেন—

> "বেয়নেট এগিয়ে এল, পাত-পিঁড়ি উচ্ছিষ্ট থাকল পরে
> কাকজোছনার নীচে শালবন, পোড়া ঘাস, রণঘোর বিরহ-আষাঢ়
> এসেছিল একদিন জীবনের বলাধান, সেই কতদিন আগে
> দারুণ সংঘাত।"[১০]

অর্থাৎ দিন বদলের কাণ্ডারি হয়ে এসেছিল নকশালেরা কিন্তু বলাধান বেরোবার আগেই শাসকের রক্তচক্ষুর কাছে সবকিছু নিঃশেষ হয়ে যায়। এই ভাবে 'যাও পাখি' কবিতায় নকশালদের কার্যকলাপকে পরম মমতায় এঁকেছেন কবি।

'চিতায়, বিবরে' : স্বাধীনতার প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যেকার অপ্রাপ্তিজনিত বেদনা কিছুটা ভাষারূপ পেয়েছে এই কবিতায়। ব্রিটিশ রাজশক্তির দুই শত বছরের শাসনের পরেও দেশের সম্পদ পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে যায়নি। স্বাধীনতার সময়েও তার কিছুটা অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পরে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ভণ্ডামি ও আখের গোছাবার রাজনীতি দেশের জন্য হয়ে উঠেছে ভয়াবহ। তাঁদের লোভের কাছে বিকিয়ে গিয়েছে দেশ। তাই কবি বলেন—

> "তবু কিছু ভুল ছিল পদভার গ্রহণের আগে"[১১]

এই কারণে স্বাধীনতার অনেকটা সময় উত্তীর্ণ হলেও দেশের অগ্রগতি কখনোই আশাব্যাঞ্জক হয়ে ওঠেনি। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সুযোগের সদব্যবহারের মাধ্যমে শুধু দেশমাতৃকার শোষণ করে গেছেন।

'নখরে, আঙুলে' : এটিও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ভণ্ডামি ও আখের গোছাবার রাজনীতিকে কশাঘাত করে লেখা। ভোট সর্বস্ব রাজনীতির ময়দানে দেখা যায় নেতাদের অভিনয়। যেন মানুষের জীবন নিরাময়ের নেশায় তাঁরা উন্মাদ। অন্যদিকে মানুষও 'নুনপ্রিয়' অর্থাৎ ভোগবাদী বা আত্মসর্বস্ব। রাজনৈতিক নেতৃত্ববৃন্দ এই সব মানুষের বিশ্বাস প্রহরী হয়ে কাজ করেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় তার উল্টো চিত্র। ক্রমাগত শোষণই তার একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায়। ক্রমাগত শোষণ করেন আর ভাবতে থাকেন তার সাম্রাজ্যের কোনো পতন নেই। আর অনুসন্ধান করতে থাকেন ভোট বাড়াবার ফন্দি-ফিকির। কবি নেতৃবৃন্দের এই ধরণের আচরণকে কশাঘাত করে তাকে জনগণের হৃদয় খুলে দেখতে বলেন। এই ভাবে তথাকথিত কায়েমী স্বার্থাণ্বেষী রাজনীতিকে ঝেড়ে ফেলে মানবতার যাত্রাপথকে প্রশস্ত করেন তিনি—

> "যদি পার তবে অঞ্জলি ভরে নাও হৃদয় স্পন্দন
> সুযোগের ব্যবহারে প্রহারে সংগমে জানো
> ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য তুমি যা শিখেছ এতদিনে
> ঘাড় গোঁজ করে ক্রোধে দীর্ঘ একযুগ—
> পেড়ে ফেলো, তাক করো, অব্যর্থ খিমচি দাঁতে নখরে আঙুলে।"[১২]

'একটি প্রেমের কবিতা' — জীবনাভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ কবির চোখে একটি ব্যর্থ প্রেমের আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। কবিতাটির শুরুতে কবি জীবনানন্দীয় ভাষায় তার একটি স্বরূপ এঁকেছেন এভাবে—

> "তোমার মুখের পাশে সাদা ঘ্রাণ, মৃত এক নক্ষত্রের আলো
> তোমার ঊরুতে বিষ, স্বপ্নের কামুক রেশ রয়ে গেছে আজও
> হয়তো আমার নয়— তবু আমি ওইখানে গিয়েছি মায়ায়
> বশ্য শিকারের কাছে ওত পেতে কিছু ভুল তুলে এনে
> দেখেছি জীবন"[১৩]

ঘ্রাণ শক্তি আমাদের গন্ধ আস্বাদনের ক্ষমতা বোঝায়। আখানে 'সাদা ঘ্রাণ' মানে অনুজ্জ্বল বা ফ্যাকাশে অর্থাৎ ঘ্রাণের আস্বাদহীনতাকে বোঝাচ্ছে। যথার্থ প্রেমে একটি মানুষ প্রত্যাশা করে অপরপক্ষ তাকে অনুভব করবে। কিন্তু 'সাদা ঘ্রাণ'

শব্দ প্রয়োগে প্রেমের উত্তাপহীনতার দিকটিই অধিক প্রকটিত হয়। যেন চিহ্নায়িত সেই প্রেমিকার মুখটিতে নেই কোনো ঔজ্জ্বল্য। আর কাম, রিপু ইত্যাদি শরীরবৃত্তিয় কবির কাছে বিষময়। কেননা কামের বাস্তব স্বরূপের তুলনায় তার কল্পিত রূপটি হয় অনেক বেশি শক্তিশালী। কামনার সেই রেশ হয়তো এখনো অপরপক্ষের মনে কিছুটা রয়ে গেছে কিন্তু কবির কাছে তা আর অবশিষ্ট নেই। কারণ কবি ইতিমধ্যে কামনার কাছে বশ্যতা গ্রহণে বেশ কিছু ভুল করে ফেলেছেন এবং সেই শিক্ষায় তিনি জীবনকে অনুধাবন করতে শিখেছেন। তাই প্রেম এখনো কবির কাছে জলের দাগ হয়েই রয়ে গেছে। মনের কোটরে স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে সঞ্চিত রয়েছে। প্রেমের পরিবর্তিত অবস্থাকে তার কাছে মদ্যপানের নেশার মতোই মনে হচ্ছে। যাকে কবি ঘাসের পাতায় ফড়িংয়ের বসবার দাগ বা জলের দাগ বা পানের পর গেলাস-স্মৃতি চিত্রকল্পে ধরতে চেয়েছেন। এই ভাবে যৌবনের সেই দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছে তার রঙ-রস নিয়ে। যে জীবনে প্রেম কবির কাছে এসেছিল শান্ত রসের আধারে। এরকম ভাবেই মননক্রিয়াকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চালিত করেছে কবিতাটি।

'বোঝাতে চেয়েছি' : নিত্য মালাকারের কবিতা-দর্শন, তাঁর কবিতার স্বরূপ সম্পর্কিত একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে এই কবিতাটিতে। তাই একে কবিতাদর্শন বিষয়ক কবিতা বলা যেতে পারে। তাঁর কবিতার স্বরূপ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

> "একবারও খুলে দেখাতে পারিনি তবু বোঝাতে চেয়েছি
> আমার ভেতর দিয়ে যারা যায়— সোনালি রূপালি
> মাছের উপমা নেই, পৃথিবীর ঘাসে ঘাড় হেঁট
> চিনির কেলাসে মুগ্ধ সংঘযান, প্রজন্মকাতর"[১৪]

কবি পরিষ্কারভাবেই বলেন তাঁর কবিতায় কোনো স্বপ্নবিলাসিতা বা মনোহারিত্ব সৃষ্টির প্রয়াস নেই। 'সোনালি' ও 'রূপালি' মাছের উপমায় যা প্রতীয়মান। পৃথিবীর ঘাসে ঘাড় হেঁট করে মানুষের কথাই লেখেন তিনি। 'কেলাস' অর্থে স্ফটিক বা দানাবাঁধা ক্রিস্টাল আর 'সংঘারাম' বৌদ্ধ ধর্মের জীবনচর্চা তথা দার্শনিক অভিজ্ঞতাকেই ফুটিয়ে তোলে। অর্থাৎ তিনি বলতে চাইছেন— তাঁর কবিতা জীবনাভিজ্ঞতার সংঘবদ্ধ রূপ এবং তা মানুষকে নিয়ে ও মানুষের জন্যই রচিত। প্রজন্মকে টিকিয়ে রাখার দায়ও এর মধ্যে সক্রিয়। এরপর তিনি বলেন—

> "আমার ভেতর থেকে বাহ্বাস্ফোট, কঙ্কালের চোয়ালের
> স্খলিত বিবশ ক্রোধ— কালহীন চোখ
> লক্ষ স্থির, নাসারন্ধ্রে মহানুভবতা হাসি জরাজীর্ণ ভাষা
> কোথায় চলেছি"[১৫]

কবির রাগ, শক্তি, দম্ভ, ক্রোধ ইত্যাদি এখানে মুখ্য নয়। 'কালহীন চোখ' অর্থাৎ সময়ের দুরন্তপনায় আত্মসমর্পণ না করে সত্য ও স্থির লক্ষে তাঁর যাত্রা। এই ভাবে কবি কোথায় চলেছেন সেকথা জানে শুধু তাঁর কবিতারা। যা আবার কলসির ধোঁয়ার মতো ক্ষণস্থায়ী। জীবনের ব্যক্তিগত যন্ত্রণাকে অস্বীকার করেও তিনি কবিতার জন্য ধ্যানমগ্ন থেকেছেন। দিনানুদিনতার যাবতীয় উষ্ণতার ঊর্ধ্বে, উত্থান-পতনের ঊর্ধ্বে রয়েছে যে জীবন— তাই-ই প্রকৃত জীবন। নিত্য মালাকার কবিতায় সেই প্রকৃত জীবনের কথা বলেছেন।

'ভাসমান রাখে' : আমরা জানি সত্যিকার অর্থে কবিতা রচনা কোনো সহজ কাজ নয়। এলিয়েট বলেছেন কবিতা রচনা হলো রক্তকে কালিতে রূপান্তরের যন্ত্রণা। মানসলোকের বিমূর্ত ভাবনাগুলি বিচূর্ণীভবনের মতো অত্যধিক জটিল পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাত হয়ে সংঘবদ্ধ রূপ লাভ করে কবিতায়। অর্থাৎ সন্তান প্রসবের মতো কবিতারও রয়েছে জন্মযন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণাকে স্মরণে রেখেই একালের কবিকুল নিজেদের অক্ষরকর্মী বলেন। নিত্য মালাকারের এই কবিতাটি কবিতার সেই জন্ম মুহূর্তকেই ধারণ করে রয়েছে।

কবির বৌদ্ধিক জগতে প্রথমে একটি শব্দ, একটি ভাবনা আসে; যা তাকে ভাসিয়ে রাখে বা বিচরণশীল রাখে। এই প্রক্রিয়ায় কবির বৌদ্ধিক স্তরে ক্রমাগত ভাঙা-গড়া চলতেই থাকে। নির্মাণ-বিনির্মাণের মধ্যে ক্রমাগত নিয়োজিত থাকতে থাকতে একটা সময় যেন কবির মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। যা থেকে ক্রমশ নিষ্কাশিত হতে থাকে ধোঁয়া বা সৌরভ।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 12 - 21
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এইভাবে চেতনা সম্প্রসারিত হয়ে জন্ম নেয় একটি কবিতা। কবিতার জন্মের সেই ব্রাহ্ম মুহূর্তটিকে দেখে নেওয়া যাক কবির ভাষাতেই—

> "মাথায় আগুনভাণ্ড— ধূপ, না সুরভি তার
> ধূমায়মান শরীরে গাছপালা ভেঙে লতাবিতানে সজ্জিত হয়,
> বিচরণশীল
> ওই সে শব্দের বাঘ— ধুম্র পেঁচা, ভয়াবহ ডাকে
> ডেকে যায়, ডেকে নিয়ে যায় তার গর্ভগৃহ অন্ধকারে
> ভাসমান রাখে।"[১৬]

নিত্য মালাকারের 'সূত্রধারের স্বগতোক্তি' কাব্যের ৩৯টি কবিতার মধ্যে ১৫টি কবিতা বিশ্লেষিত হয়েছে বক্ষ্যমাণ সন্দর্ভে। সবগুলি কবিতার আলোচনা নিবন্ধের সীমাবদ্ধ পরিসরে সম্ভবপর নয়। তথাপি এই ১৫টি কবিতার আলোচনার মাধ্যমে আমরা কাব্যগ্রন্থটি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা তৈরি করতে পেরেছি। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিকে বিষয় অনুযায়ী শ্রেণি বিভাগ করলে পাই— ১. ব্যক্তিগত জীবন বীক্ষণ সম্পর্কিত কবিতা, ২. শিল্পবোধ সম্পর্কিত কবিতা, ৩. কবিতাদর্শন বিষয়ক কবিতা, ৪. সমাজভাবনা বিষয়ক কবিতা, ৫. প্রেমভাবনা বিষয়ক কবিতা, ৬. মৃত্যুভাবনা বিষয়ক কবিতা, ইত্যাদি।

উত্তরবঙ্গের বাংলা কবিতায় ছয় ও সাতের দশকে অনেক কবির আবির্ভাব ঘটেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন— সমীর চক্রবর্তী, সনৎ চট্টোপাধ্যায়, তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল ভট্টাচার্য, দীপ্তিময় সরকার, অরুণেশ ঘোষ, পুষ্পজিৎ রায়, রণজিৎ দেব, সমীর চট্টোপাধ্যায়, ত্রিদিব গুপ্ত, শামসের আনোয়ার, রতন বিশ্বাস, ষষ্ঠী বাগচী, কমলেশ রাহা রায়, তুহিন দাস, ব্রততী ঘোষ রায়, নীরদ রায়, পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত, কঙ্কণ নন্দী, বিজয় দে, সমর রায়চৌধুরী, বেণু সরকার, সমীরণ ঘোষ প্রমুখেরা। এই সব প্রতিনিধিস্থানীয় কবিদের ভিড়েও নিত্য মালাকারকে আলাদা করে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। এর প্রধান কারণ নিত্য মালাকারের কবিতার গঠনকৌশল। বিষয় ব্যতিরেকেও শুধুমাত্র নির্মাণকলায় তিনি বাংলা কাব্যসাহিত্যে আলাদা ডিসকোর্স তৈরি করতে পেরেছেন। অক্ষরবৃত্ত ও গদ্যছন্দে তাঁর অসাধারণ নিপুনতা এবং তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার নিত্য মালাকারকে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে দিয়েছে।

Reference:

১. মালাকার, নিত্য, অজ্ঞাতবাস ইতিবৃত্ত এবং প্রসঙ্গত পালাবদল, 'তিতির' সঞ্জয় সাহা (সম্পা.), মাথাভাঙ্গা, ঊনবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ৮২
২. মালাকার, নিত্য, আমার কবি জীবন আমার কবিতাচর্চা অথবা একটি আত্মনির্মাণ প্রয়াস, 'তিতির' সঞ্জয় সাহা (সম্পা.), মাথাভাঙ্গা, ঊনবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ৯৫
৩. তদেব, পৃ. ৯৭
৪. মালাকার, নিত্য, কবিতা সংগ্রহ প্রথম খণ্ড, ২০১৪, অস্ট্রিক, পূর্ব মেদিনীপুর, পৃ. ২০
৫. তদেব, পৃ. ২১
৬. তদেব, পৃ. ২৪
৭. তদেব, পৃ. ২৫
৮. তদেব
৯. তদেব, পৃ. ২৯
১০. তদেব, পৃ. ৩০
১১. তদেব, পৃ. ৩২
১২. তদেব
১৩. তদেব, পৃ. ৩৩